ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 43-57
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.433

বাংলা ছোটোগল্পে শৈলরাজ হিমালয়: রূপে-রূপান্তরে

ড. মহাদেব দাস, *স্বাধীন গবেষক, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The article surveys the role of the Himalayas in Bengali short story, emphasizing how the mountain range shifted from a divine symbol to a literary backdrop for human experience. Rather than focusing on a single author, it highlights a broad constellation of writers who enriched this tradition. Rabindranath Tagore used Himalayan settings in stories like *Durasha*, *Pragati Sanghar*, and *Haimanti*, where the mountains mirror emotional turbulence, cultural conflict, and philosophical reflection. Hemendra Kumar Roy and Trilokyanath Mukhopadhyay contributed adventure-oriented narratives, weaving Himalayan landscapes into tales of mystery and exploration. Jaladhar Sen and Bonophul emphasized the natural beauty and spiritual resonance of the region, blending descriptive passages with human drama. Kanti P. Dutta and Sanjib Chattopadhyay added further dimensions, portraying the Himalayas as spaces of cultural negotiation, romance, and moral testing. Across these diverse works, the Himalayas are not merely scenery but an active presence. They embody grandeur and danger, serenity and struggle, becoming metaphors for resilience, longing, and transformation. The stories often juxtapose the permanence of nature with the fragility of human desire, while also reflecting broader social changes in nineteenth- and twentieth-century Bengal. Taken together, these authors demonstrate how the Himalayas inspired a rich vein of Bengali short story— romantic, spiritual, tragic, and philosophical. The mountain range emerges as a multidimensional symbol: sacred yet secular, natural yet cultural, timeless yet responsive to historical shifts. This collective literary engagement ensures that the 'King of Mountains' remains central to the Bengali imagination, shaping narratives that explore identity, emotion, and the human condition.

Keywords: Himalaya, Rabindranath, Short Story, Nature, Jaladhar Sen, Troilokyanath, Hemendra Kumar, Banaful, Romance, Emotion

বাংলা সাহিত্য দেবতাত্মা গিরিরাজ হিমালয়কে কেন্দ্রে রেখে বিষয়বস্তুর এক অন্তহীন উৎসের সন্ধান পেয়েছে। এই পথরেখা ধরে হিমালয়কেন্দ্রিক সুসমৃদ্ধ, আকর্ষণীয়, শিক্ষণীয়, রোমান্টিকতাপূর্ণ, ধর্মময়, আত্মতত্ত্বময়, অনুভববেদ্য, বহুমাত্রিক, বহুগুণান্বিত সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। ভারতীয় সাহিত্যে হিমালয়ের উপস্থিতি যথেষ্ট উজ্জ্বল। রত্ন-প্রসবিনী সংস্কৃত সাহিত্যের সৃজন-ভূমিতে হিমবন্ত হিমালয়ের বহুমাত্রিক উপস্থাপনা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণকে বর্ণময় করে তুলেছে।

উনিশ ও বিশ শতকের কথাসাহিত্যের ধারায় হিমালয় সামগ্রিকভাবে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। ইংরেজ আগমনের পর থেকে বাঙালির সমাজ, ধর্ম ও জীবন ভাবনায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। হিমালয়কে

আর দেবচরিত্র হিসাবে না দেখে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে, ভ্রমণক্ষেত্র হিসাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। শৈলরাজকে পটভূমিকায় রেখে বাংলা সাহিত্যের গল্পকারেরা তাঁদের স্বকপোলকল্পিত আখ্যানের জাল বিস্তার করেছেন।

শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট হিসাবেই নয়, গিরিরাজের প্রতি অকৃত্রিম ভালোলাগা আর হিমালয়ের অধিবাসীদের প্রতি গভীর ভালোবাসা হিমালয়কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। যে প্রকৃতিচিত্রণ কাব্যে বা ভ্রমণসাহিত্যে মন হরণ করে বারবার, সেই প্রকৃতির অনাবিল উপস্থিতি কথাসাহিত্যকে রসসিক্ত করেছে। জীবনভাবনার ভিন্ন গতিমুখরতা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে নির্মাণরীতির এই নবীন কুশলতায়। ছোটোগল্পের ইতিহাসে হিমালয়ভাবনা রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুনভাবে অভিষিক্ত হয়েছে। হেমেন্দ্রকুমার রায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, বনফুল, কান্তি পি দত্ত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছোটোগল্পকার হিমালয়কেন্দ্রিক ছোটোগল্পের প্রবাহকে সুসমৃদ্ধি দান করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটোগল্প 'অমরগুচ্ছ'তে হিমালয়ের প্রসঙ্গ এসেছে নায়িকার ভ্রমণের সূত্রে। বালবিধবা হলেও নায়িকা ছিলেন পিতামাতার বড়ো আদরের কন্যা। বিধাতার বিধানে পিত্রালয়ই তাঁর চিরদিনের আশ্রয়স্থান। স্বামীকে তাঁর মনেও পড়ে না। যার অভাবে কথক নায়িকার জীবন শূন্য, কে তিনি, নায়িকা জানেন না। তবু তাঁর ধ্যানে, তাঁর স্মৃতিতে তিনি নিজেকে পূর্ণ করে রাখতে চান শিক্ষা ও সংস্কারের বশে। স্বামীর একটি মাত্র অস্পষ্ট ফটোগ্রাফ তাঁর সম্বল। এটাই তাঁর 'জীবন তরণীর পক্ষে ধ্রুবতারা স্বরূপ'।

ষোড়শী নায়িকা দাদার সঙ্গে নৈনিতালে বাস করতেন। এক রবিবার দাদার বিলাতি বন্ধু এঞ্জেলের আগমন নায়িকার জীবনে অসীম সুখের হিল্লোল এনে দিল। এতটাই তিনি আত্মহারা হয়ে উঠলেন যে, পূজ্য স্বামীর ছবিখানিও সপ্তাহখানেক দেখার কথা পর্যন্ত মনে হয়নি। তাঁর চোখে এঞ্জেলের মতো সুন্দর পুরুষ সংসারে আর দ্বিতীয়টি নেই।

প্রায় সপ্তাহখানেক অতিবাহিত হওয়ার পর এঞ্জেলের বিদায়ের যখন আর একটি দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নায়িকার দাদা তাদের নিয়ে টাইগারহিলে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। নৈনিতালের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ টাইগারহিল:

> "এখান হইতে তুষারাচল শ্রেণী—অতিশয় সুবিস্তৃত ও মনোহররূপে নেত্রগোচর হয়। দার্জিলিং গিয়া সিঞ্চলশিখর হইতে প্রত্যূষে মেঘশূন্য নির্ম্মল দিগন্তে নব সূর্য্যকিরণদীপ্ত তুষারশৃঙ্গরাজির শোভা যিনি না দেখেন তাঁহার যেমন দারজিলিং যাত্রা বৃথা, টাইগারহিল হইতে হিমালয় শোভা না দেখিলে নইনিতাল যাত্রাও সেইরূপ সুসিদ্ধ হয় না।"[১]

নায়িকা, তাঁর দাদা এবং অতিথি এঞ্জেল পরের দিন সূর্যালোক সিঞ্চিত প্রাতঃকালে ফুল্ল-বসন্ত শোভিত পার্বত্য পথে সুন্দর দৃশ্য আর সুগন্ধ বায়ু উপভোগ করতে করতে শিখরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নায়িকা গল্পের মধ্যেই উপস্থাপন করলেন হিমালয়ের অনিন্দ্য শোভার বর্ণনা:

> "কি মনোমুগ্ধকর চমৎকার দৃশ্য। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলাম কি যেন ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে আমাদের পদতলের পাহাড় দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। আমরা তুষারদৃশ্য সম্মুখে করিয়া এক সমুচ্চ চূড়ায় চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি। তুষারাচল শ্রেণী, দিগ্বলয় বিলোপ করিয়া উচ্চনীচ শত শৃঙ্গে, স্তরে স্তরে, পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে, নীল শুভ্র মেঘাম্বরে—হীরকমণ্ডিত স্তম্ভ শোভায়, শত নক্ষত্রদীপ্তিতে অপূর্ব্ব গম্ভীর মহিমায় বিভাসিত। ইহাই কি কৈলাস! আমরা কি সহসা জীবন্মুক্ত, সশরীরে দেবনিকেতনে আগমন করিলাম। সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বিভ্রম হইতে লাগিল, ভয় হইতে লাগিল এখনি এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে।"[২]

স্বপ্ন অবশ্য তৎক্ষণাৎ না ভাঙলেও পরে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। সহসা নায়িকার নজরে পড়ে একটি সুন্দর পার্বত্য ফুল। কিন্তু কিছুদূরের আলাদা একটি পাহাড়ে তা ফুটেছিল। এঞ্জেল কোন নিষেধবাক্য শোনার আগেই এই পুষ্প আহরণের উদ্দেশ্যে পদচিহ্নহীন ঢালু, পিচ্ছিল, প্রস্তরস্তূপ পরিপূর্ণ পথে নেমে যান এবং সেই ফুল আহরণ করে আনেন। পরে তা নায়িকার হাতে প্রদানকালে ফুলটির নাম দেন 'অমরপুষ্প'। নায়িকার চোখে সেদিন "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রীতিময়, সৌন্দর্য্যময়, জীবন অস্বাভাবিক সুখময়" বলে মনে হতে লাগল। এই ফুল ছয় মাস পরেও শুকিয়ে যায় নি।

যে রোমান্টিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল গল্পের মধ্যে, তা উপসংহারে এসে বিলুপ্ত হয়ে যায়। গল্পের কথক নায়িকা এবং তার দাদার সঙ্গে এঞ্জেলের আর একবার দেখা হয় ট্রেনপথে। নবপরিণীতা পত্নীসহ সেদিনের সেই অতিথি এঞ্জেল চলেছেন এলাহাবাদ। কথাবার্তার মাঝে নায়িকা নববধূর জন্য রাখা 'যৌতুক' হিসাবে সেই 'অমর পুষ্প' প্রদান করেন। এঞ্জেল অবশ্য সেই ফুলের ব্যাপারে নিরুৎসাহ প্রকাশ করেন। গল্পের পরিণতি এক ভগ্ন প্রেমের বেদনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমালয়কেন্দ্রিক ছোটোগল্পের সংখ্যা বেশি নয়। 'দুরাশা', 'প্রগতি সংহার' এবং 'হৈমন্তী' গল্পে হিমালয়ের প্রসঙ্গ এসেছে। 'গল্পগুচ্ছে'র অন্যতম গল্প 'দুরাশা'র প্রেক্ষাপট রচনা করেছে হিমালয়। ঘটনাস্থান দার্জিলিং। গল্পকথক বাঙালি কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক মেঘ-বৃষ্টিময় শৈলশহরের খারাপ আবহাওয়ায় আপাদমস্তক ম্যাকিন্টশ পরে বেড়াতে বের হন। গল্পের মুখ্য চরিত্র বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর কন্যার হৃদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকৃতি ব্যথিত, অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে:

> "ক্ষণে ক্ষণে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালয় পর্বত-সুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।"[৩]

এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কথক হঠাৎ নারীকণ্ঠের 'সকরুণ রোদনগুঞ্জনধ্বনি' শুনতে পেয়ে আগ্রহ অনুভব করলেন। সেই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে এই কান্নাটুকুকে জগতের একমাত্র কান্না হিসাবে তাঁর কাছে প্রতিভাত হল। সন্ধানের পর দেখলেন এক গৈরিকবসনাবৃতা নারীর বেদনাময় ক্রন্দন এটি। কথা বলার পর সেই নারীর পরিচয় পেয়ে কথক বিস্মিত হলেন।

হিমালয় বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুজন পান্থ নরনারীর রহস্যময় আলাপের কাহিনি কবোষ্ণ কাব্যকথার মতো শুনতে হয়। পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জন গিরিকন্দরের ঝরনার ধ্বনি এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব-মেঘদূতের বিচিত্র সংগীত-মর্মর জাগ্রত হয়ে উঠতে থাকে। আলোচ্য গল্পের কাহিনিতে অবশ্য তেমন অনুভূতির অবকাশ নেই বলে গল্পকার জানিয়েছেন। হিন্দুস্থানী রমণীর সঙ্গে বুট এবং ম্যাকিন্টশ পরিহিত নববিকশিত বাঙালি সাহেবের কথোপকথন বিশ্ব জগতের দুই খণ্ড প্রলয়াবশেষের মতো অবশিষ্ট ছিল।

দিল্লির সম্রাট-বংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল নায়িকার বংশে। তাই কুলগর্ব রক্ষা করতে গিয়ে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান যখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। সেরকম সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নবাব গোলাম কাদের খাঁর বিবাদ চরমে ওঠে। কাদের খাঁর ফৌজের অধিনায়ক ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ কেশরলাল। এই কেশরলালের প্রতি কাদের খাঁর কন্যা ঐক্য-সম্বন্ধ কল্পনা করে হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করতেন। কাদের খাঁ কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না বলে কেশরলালের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কাদের-কন্যা গোপনে কেশরলালের কাছে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় অলংকার গোপনে পাঠিয়ে দেন রসদ হিসাবে এবং অন্তরে লাভ করেন গভীর

আনন্দ। শেষ পর্যন্ত কেশরলাল এবং তার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের রক্তাক্ত দেহ আবিষ্কার করেন কাদের-কন্যা। বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য নবাব-কন্যা:

> "কিশোরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুবিলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বারংবার তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম, আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহু দিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উদ্বেল হইয়া উঠিল।"[৪]

গোলাম কাদের খাঁর কন্যার পরিচয় পেয়ে আসন্ন মৃত্যুকালে 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী' বলে আহত সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন কেশরলাল। তিনি নৌকায় করে একাকী সেখান থেকে চলেও গেলেন। কাদের-কন্যার পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলী হিমালয়ের দুর্গম পথের মতো জটিল এবং ভয়ানক। হিমালয়-কাঠিন্যে কাদের-কন্যা বলে ওঠেন:

> "কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য-অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা কাল্পনিক। একবার বাহির হইয়া পড়িলেই একটা চলিবার পথ থাকেই। সে পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ; সে পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে—তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তাহার সুখেদুঃখে বাধাবিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।"[৫]

কাহিনিকালের আতশবাজির দহন শেষ হয়ে গেছে। পরম দুঃখের, চরম সুখের আলোক শিখা নিভে গেছে। এখন কাদের-কন্যা পথপ্রান্তের ধুলোর ওপর জড় পদার্থের মতো স্থির হয়ে পড়ে আছেন। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে কেশরলাল তাঁতিয়া টোপির দলে মিলিত হয়ে বিপ্লবের আকাশে নক্ষত্র হয়ে গেছেন। আর কাদের-কন্যা সংসার ত্যাগ করে যোগিনী সেজে কাশীর শিবানন্দ স্বামীর কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে হিন্দু বিদূষী নারীর মতো নিজেকে ব্রাহ্মণ কন্যাপ্রায় করে তুলেছেন।

পরে কেশরলালের খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি জেনেছেন যে, রাজদণ্ডের গ্রাস থেকে পালিয়ে কেশরলাল নেপালে আশ্রয় নিয়েছেন। নেপালে গিয়ে তাঁর খোঁজ পাননি কাদেরকন্যা। পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করতে করতে ভুটিয়া লেপচাদের ম্লেচ্ছ দেশে কিশোরলালের খোঁজ পান শেষ পর্যন্ত। ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তার গর্ভজাত পৌত্র পৌত্রী নিয়ে গৃহবাসী বৃদ্ধ উঠোনে ভুট্টা থেকে শস্য সংগ্রহ করছিলেন। নবাব-কন্যা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উচ্চারণ করেছিলেন জীবনের মর্মন্তুদ কথা:

> "যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। ...হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর-এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ। আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"[৬]

কোন কোন মানব-মানবীর জীবনের উত্থান-পতন, আলো-ছায়া, সুখ-দুঃখ হিমালয়ের কোমল-কঠিন, সুন্দর-ভয়ংকর, পাদভূমি-শিখরদেশের সঙ্গে তুলনীয় হয় কাদের খাঁর কন্যার জীবনের মতো। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুরাশা' গল্পের প্রেক্ষাপটে হিমালয়ের দুর্গম-মুখর কুজ্ঝটিকার উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রগতি সংহার' গল্পে হিমালয় এসেছে ঘটনাচক্রে। এখানেও দার্জিলিং শহরের কথা উঠে এসেছে। তবে হিমালয় ভ্রমণের সূত্রে কালিদাস এবং তাঁর শ্লোকখণ্ডের উপস্থিতি গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা দান

করেছে। একটি কো-এড কলেজের কথা বিশেষভাবে এসেছে এই গল্পে। ছেলেমেয়েদের মেলামেশা এই কলেজে কিছু বাড়াবাড়ি মাত্রায় ছিল। ধনী ছেলেদের গর্ব খর্ব করার মতো 'নারীপ্রগতি সংঘ' নামে একটি সংঘ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সেই সংঘের হাল ধরে কড়া স্বভাবের মেয়ে সুরীতি। ছেলেদের ওপর রূঢ় ব্যবহার এবং কারণে অকারণে বিদ্রূপ করাটা তাদের নতুন অভ্যাসে পরিণত হল। কোন পুরুষ পরীক্ষায় তাদের ডিঙিয়ে প্রথম হলে মেয়েদের অশ্রুপাতের কারণ হয়ে উঠতো।

ছেলেরাও কম যেতো না। তারা মেয়েদের ওপর উপদ্রব চালাতে ওস্তাদ ছিল। এই উপদ্রবের প্রধান পাণ্ডা নীহার। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্য থেকে 'যৌবনমদমত্তমাতঙ্গিনী', 'নিখিলবিশ্বহৃদয়-উন্মাদিনী', 'পূর্ণচন্দ্রনিভাননী', 'কনকচম্পকদামগৌরী' জাতীয় কোটেশন তুলে বিদ্রূপ করা তার স্বভাব হয়ে ওঠে। ফলত সুরীতির পক্ষে নীহারকে সহ্য করা কঠিন হয়।

সলিলার আর্থিক সহায়তায় দার্জিলিঙে পড়াশোনা করতে গিয়ে নীহার কষ্ট পেতে থাকে। প্রেমের অনিবার্য আকর্ষণ এবার সে অনুভব করে। হঠাৎ নিউমোনিয়ায় সলিলার মৃত্যু হলে নীহার পুরোনো কলেজেই ফিরে আসে। সুরীতি তাকে কলেজে দেখে হিমালয় থেকে কবে ফিরেছেন জানতে চাইলে নীহার বলে:

> "ওগো সীমন্তিনী, কিছু হাওয়া খেয়ে আসা গেল। কালিদাস বলেছেন: মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ। ঐ দেবদারুর চেয়ে ঢের বেশি কাঁপিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের রোগা হাড়, এই দেখো-না কম্বল জড়িয়ে ভুটিয়া সেজে এসেছি।"[৭]

নীহার স্পষ্টভাষায় জানিয়েছে যে, তার শিক্ষা স্বয়ং কালিদাসের কাছ থেকে। কিন্তু নীহারের উচ্চারিত সংস্কৃত শ্লোকগুলো সুরীতির মনের ভেতরে দেবদারুর মতোই কম্পন লাগিয়ে দিতে থাকে। কলেজের অনুষ্ঠান ও কাজে নীহারের ভাষাজ্ঞান তাকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দিল।

ছোটোদের স্কুলে পড়ানোর চাকরি নেওয়া যাবে কিনা এ ব্যাপারে নীহাররঞ্জনের মতামত চাইল সুরীতি। নীহারের কষ্টের কথা ভেবে একদিন সুরীতি বেশি বেতনের প্রিন্সিপালের পদ ছেড়ে কলকাতায় অল্প বেতনে শিক্ষিকার পদ নিল। এমনকি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সুরীতি জানালার দিকে উৎসুকভাবে কান পেতে থাকল কোন পরিচিত পায়ের ধ্বনি শুনতে। তার আত্মনিবেদন অবশ্য একদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। হিমালয়ের শীতলতা একদিন তাকে গ্রাস করল। সেদিন নীহার বা তার আউড়ে চলা কালিদাস কেউই তাকে সান্ত্বনা দিতে এল না। নারী জীবনের ট্রাজেডি ঘনিয়ে এল সুরীতির জীবনে।

'হৈমন্তী' গল্পের নায়ক বিবাহ সভাতেই অনুভব করেছিলেন, দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায়, তাতেই সংসার চলে। বাদবাকি থেকে যাওয়া পনেরো আনা ধরা যায় না। তিনি যথার্থ সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন যে, অধিকাংশ লোক স্ত্রীকে কেবলমাত্র বিয়ে করে; কিন্তু স্ত্রীকে লাভ করতে পারে না সারা জীবনেও। এমনকি তাদের স্ত্রীরাও সেই না পাওয়ার খবরটুকু জানতে পারে না আজীবন! হৈমন্তী সম্পর্কে নায়কের অভিমত গল্প-পাঠকের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

> "কিন্তু, সে যে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ। ...সে সূর্যের মতো ধ্রুব; সে ক্ষণজীবিনী ঊষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়।... দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে, কী নিবিড় পবিত্র।"[৮]

বিবাহসভার প্রতিটি মুহূর্তকে নায়ক সমস্ত চৈতন্য দিয়ে স্পর্শ করেছেন। যাবতীয় হট্টগোলের মাঝখানে যখন হৈমন্তীর কুসুমকোমল হাতটি নায়কের হাতের ওপর এসে পড়ল, তখন আশ্চর্যভাবে নায়কের মনে হল, এ এক দুর্লভ প্রাপ্তি; এ এক অপরিসীম রহস্য। হৈমন্তীর পিতা গৌরীশঙ্করের চরিত্রটিও বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তাঁর নাম, কর্মস্থল, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে হিমালয়ের অভাবনীয় সাদৃশ্য রয়েছে:

> "যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল, তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।"[৯]

হেমেন্দ্রকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনির লেখক। আশিটির বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। রবীন্দ্র-শরৎ যুগে হেমেন্দ্রকুমারের রচনার বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত সময়কালে শিশুসাহিত্যিক হিসাবে যে ক'জনের খ্যাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় অন্যতম। শিশুরঞ্জন সাহিত্যে এই সময়ে তিনিই ছিলেন মধ্যমণি। তাঁর রচনা সমূহের মধ্যে হিমালয় খুব বেশি আসেনি। 'হিমাচলের স্বপ্ন' নামক তাঁর একটি গল্পে হিমালয় এসেছে পরোক্ষ প্রেক্ষাপট হিসাবে। শিশুসাহিত্যে হিসাবে গল্পটি অতুলনীয়।

গল্পটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি ভাল্লুক—ভল্লু। সে জন্মেছিল হিমালয়ের জঙ্গলে। ভল্লুক বংশে যারা কুলীন বলে মর্যাদা লাভ করে তাদের জন্ম হিমালয়ের কোলে! ভল্লু যখন নিতান্ত দুগ্ধ পোষ্য, তখন এক শিকারি তাকে ধরে ভল্লুক আর বাঁদরের খেলা দেখানো ব্যক্তির কাছে তাকে বিক্রি করে দেয়। সেই ব্যক্তির কাছ থেকে ভল্লু বিচিত্র সব খেলা শেখে। ফলে লোকের বাহবা, শিশুদের হাততালিতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিন সেই লোকটি হঠাৎ মারা গেলে ভল্লু অনাথ হয়ে পড়ে এবং তার আশ্রয় হয় আলিপুর চিড়িয়াখানায়। বছর খানেক চিড়িয়াখানায় বাস করলেও তার মোটেও এখানে বাস করতে ভালো লাগে না। সে তার ঘোঁৎ ঘোঁৎ ভাষায় দর্শক খোকা খুকুদের উদ্দেশ্যে বলত যে, তারা একটা ডুগডুগি আনতে পারে কিনা! কিন্তু মানুষের বাচ্চারা তার সেই ভাষা বুঝত না। ভল্লু মাঝে মাঝে স্মৃতির স্বপ্নমেদুরতায় হারিয়ে যেত:

> "মাঝে মাঝে তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত। সেই বিরাট হিমালয়! তুষার-মুকুট উঠেছে তার নীলাকাশের অসীমতায়, শিখরের পর শিখরের আশপাশ দিয়ে সাদা সাদা মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে তাকে প্রণাম করে। নীচের দিকে দুলছে তার গভীর অরণ্যের সবুজ অঞ্চল—সেখানে মিষ্টি গান গাইছে কত পাখি, আতরের ভুরভুরে গন্ধ বিলিয়ে দিচ্ছে কত ফুল, রংচঙে টুকরো উড়ন্ত ছবির মতন ঘোরাফেরা করছে কত প্রজাপতি। জঙ্গলের বুকের ভিতরে আলো-আঁধার মাখা রহস্যময় স্বপ্নপুর, তারই মধ্যে ছিল তার সুখের বাসা।"[১০]

একদিন শান্তশিষ্ট ভল্লু চিড়িয়াখানার দরজা খোলা পেয়ে একলাফে বাইরে বেরিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! কলকাতার রাস্তায় নেমে জাম্ববানের বংশধরটি বেশ খুশি। আজ সে হিমালয়ের স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন ফের দেখা শুরু করেছে। আজ তাকে পেয়ে বসেছে পথের নেশা। হয়ত এভাবেই সে ফিরে পাবে দূর-দূরান্তে হারিয়ে যাওয়া হিমালয়কে।

রাত্রির অন্ধকারে মহানগরীর পথ ধরে পালানোর সুবিধা থাকলেও দিনের বেলায় বড় সমস্যা হল। মেয়ে স্কুলের পিকনিকের খাবার অভুক্ত ভল্লু সাবাড় করার পর পালানোর সময় মনসা গাছের ঝোপের ওপর পড়ে তার মনে হল গাছ একসঙ্গে এতগুলো কামড় মারে! একজন পাখিমারা বন্দুক দিয়ে তাকে আঘাত করলে ভল্লু চমকে উঠে পলায়ন করে। হিমালয়ের পথে যে এত বাধা আজ সে বেশ অনুভব করছে। উড়ে বামুনের ঘরের ঝাল তরকারি খেলে ভল্লুর দুর্দশা শুরু হল। সে ঝাল সহ্য করতে পারল না।

কলকাতা শহরের নিকটবর্তী এক শহরে ভোট উপলক্ষে বেশ ভুরিভোজের আয়োজন হচ্ছিল। ভল্লু সেখানে পৌঁছায় এবং মনের সুখে রান্না করা খাবার গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হয়। দিনের বেলা পথ চলায় সমস্যা দেখে ভল্লু এবার থেকে রাতে পথ চলা শুরু করে। কোনদিন অনাহারে থাকলেও সে চিড়িয়াখানায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে একদিন সে চোরের কাটা সিঁধের গর্ত দিয়ে এক গৃহস্থের ঘরে ঢুকে পড়ে। সেখানে তার জন্য দুটো চোর বমাল ধরা পড়ে এবং বাড়ির ছোট্ট খোকার সাদর আহ্বান অস্বীকার করতে না পেরে ভল্লু সেখানে ধরা পড়ে যায়। বাড়ির লোকেরা খোকার খেলার সাথি করার জন্য ভল্লুকে পুষতে চায়।

কুকুরের চেনে বন্দী ভল্লু অবশ্য একদিন চেন ছিঁড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের বিয়ে বাড়িতে খাবারের গন্ধে তার অনুপ্রবেশ গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। 'নতুন রকম লাঠি'র গুড়ুম গুড়ুম শব্দে ভয় পেয়ে ভল্লু পালিয়ে যায়। জঙ্গলে বাঘের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে ভল্লু ভয় পায়নি। এরপর লোকালয়ে গিয়ে এক মেয়ে-ভাল্লুকের দেখা পায় ভাল্লুক ওয়ালার কাছে। তার সঙ্গে প্রেম জমানোর বিরাট অবকাশ পাওয়ার আগেই ভল্লুকে পালাতে হয়। সকলেই যেন ভল্লুর হিমালয়ের স্বপ্নে বাদ সাধার চেষ্টা করছে। ভল্লুকে পাখিগুলোর ভয় পাওয়ার তো কথা নয়। তবু তারা অকারণে চিৎকার করছে। ভল্লুর মনের ভাষা হেমেন্দ্রকুমার বুঝতে পেরেছেন:

> "ওরে কাক, ওরে শালিকের দল, তোরা আবার বাসায় ফিরে আয়। আমি যে পরম বৈষ্ণব, মাছ-মাংস স্পর্শ করি না! তার উপরে আমি দেখেছি হিমাচলের সুন্দর স্বপন—আমার মন ছুটছে এখন অনন্ত হিমারণ্যের শীতল স্তব্ধতার দিকে, সেই যেখানে ঝরে তুষারের ঝরনা, বুনো বাতাস আনে অজানা ফুলের গন্ধ, গাছে গাছে ফলে থাকা পাকা পাকা মিষ্টি ফল। আজ আমি স্বাধীন, আজ আমি দেশে চলেছি, আজ কি আমি জীব-হিংসা করতে পারি?"[১১]

ডাকাত দলের সর্দার কালুর হাত থেকে অপহৃত শিশু ঝুনু আর টুনুকে রক্ষা করে ভল্লু। মানুষের উপকার করতে গিয়ে ভল্লু মানুষের হাতে বন্দী হয়ে পড়ল। নবীনবাবু তাকে আবার চিড়িয়াখানায় ফেরানোর ব্যবস্থা করলেন। ভল্লুর 'হিমাচলের স্বপ্ন' চিরতরে হারিয়ে গেল তার জীবন থেকে। যে স্বাধীনতা সে পেতে চেয়েছিল, তা তার অধরা হয়েই থেকে গেল।

জলধর সেন হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক। তাঁর হিমালয় ভ্রমণের স্মৃতিকথা বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। জলধর ছোটোগল্প রচনা শুরু করেন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর শেষ গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ১১টি। বিজিতকুমার দত্ত জলধরের ছোটোগল্পে "হিমালয়ের কিছু শৈত্যপ্রবাহ"[১২] লক্ষ্য করেছেন।

'না' গল্পটির শুরুতেই লেখক অনেকের জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, তিনি হিমালয় ভ্রমণকালে কোন ভালো মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কিনা। সেই প্রশ্নের সদুত্তর যেন বক্ষ্যমাণ গল্পটি। ঝড়-বৃষ্টি, অর্ধাশন-অনশনে যাঁদের সহায়তায় হিমালয়ের পথে পথিক জলধর একাকী পথ চলতে সাহস পেয়েছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভালো মানুষ।

দেরাদুনে থাকার সময় গল্পকথক কখনো কখনো হঠাৎ উধাও হয়ে যেতেন। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর অদর্শনে কিছুমাত্র চিন্তিত হতেন না। তাঁরা জানতেন যে, কথক প্রাণে বেঁচে থাকলে ঠিকই ফিরে আসবেন। একবার দেরাদুনের বাসা থেকে বের হয়ে গল্পকথক টপকেশ্বর গিয়েছিলেন। সেদিন কোন একটা উপলক্ষে অনেক গুর্খা নর-নারী এবং বালক-বালিকা টপকেশ্বরে সমবেত হচ্ছিল। জনতার উপস্থিতি তাঁর পছন্দ না হওয়ায়, সেদিন গল্পকথক টপকেশ্বরের নিকটবর্তী পাহাড়ের একটি গুহায় সারাটা দিন কাটিয়ে বাসায় ফিরে যাবার প্ল্যান করেছিলেন।

একাধিক গুহার মধ্যে একটি গুহার পরিচ্ছন্নতা তাঁর ভালো লাগে। তিনি গুহামুখে যেতেই গুহার ভেতর থেকে কোমলকণ্ঠে কে আহ্বান করলেন 'আসুন'। কথক সেই আহ্বানকারিণীকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন:

> "আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম আমার সম্মুখে সহাস্যবদনে এক দেবীমূর্তি দণ্ডায়মান। পরিধানে গৈরিকবাস, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকের বিপুল কেশরাশি আলুলায়িত! এ যে সত্যসত্যই দেবীমূর্তি—এ যে সত্যসত্যই মাতৃমূর্তি।"[১৩]

দেবীমূর্তি জানালেন যে, তিনি কথকের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর আহ্বানে ভেতরে প্রবেশ করে গল্পকথক সাধন ভজনের উপযোগী দ্রব্যাদি দেখলেন। ইনি তাঁরই জন্য প্রতীক্ষা করছেন, অথচ তিনি স্বয়ং তাঁর বিন্দুবিসর্গ জানেন না দেখে বিস্মিত হলেন। আবহাওয়া খারাপ হতে পারে দেখে দেবীমূর্তি গুহা ত্যাগ করে নদী পার হয়ে যাওয়ার কথা বলেন। তিনি এটাও জানান যে, গল্পকথককে তিনি ইতিপূর্বে কলিকাতায় দেখেছেন। কলিকাতার পূর্ব ঘটনা কিছু তিনি স্মরণে আনার চেষ্টা করেন।

বছর সাত আটেক পূর্বেকার ঘটনা। গল্পকথক তখন কলিকাতায় লেখাপড়া করতেন। একদিন গলিপথ দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গল্পকথক যখন যাচ্ছিলেন, তখন তিনি খুব জোরে বৃষ্টি পড়া শুরু হওয়ায় যে নারীর বাড়ির সম্মুখে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, ইনিই তিনি। অপরিচিতা জানালেন, বৃষ্টিতে বেশ ভিজে যাওয়া কথক যেন তাঁর বাড়ির ভেতরে এসে পোশাক বদল করে আবহাওয়া ঠিক হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেন। এ কথায় খুশি না হয়ে সেই ব্যক্তি হঠাৎ "না" বলেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বের হয়ে গেলেন এবং দেখতে দেখতে সেই গলির মোড় পার হয়ে চলে যান।

সেই "না" সেই নারীর সমগ্র সত্তা জুড়ে সেদিন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শব্দটিকে 'কঠোর', 'ভয়ানক', 'হৃদয়ভেদী' বলে মনে হয়েছে তাঁর। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর সেই 'না'কেই তিনি বীজমন্ত্র করে পথে বের হয়ে পড়েন সন্ন্যাসিনীর বেশে:

> "আমি একদিন রাত্রিযোগে সমস্ত ফেলিয়া পথে বাহির হইলাম। কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, কাহারও উপদেশ লই নাই, শুধু জপমন্ত্র হইয়াছিল ঐ 'না' শব্দ। আমি কত স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কত দেশে গিয়াছি, কত সাধু, কত মহাজন আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি নাই। আমি একই মন্ত্র পাইয়াছিলাম—সেই 'না'।"[১৪]

তারপর কোনভাবে তিনি কথকের দেরাদুনে উপস্থিতির কথা জেনে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এখানে কথকের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাঁকে দর্শন দেবার জন্য গল্পকথক তথা 'না' এর কথককে এখানে আসতেই হবে। তিনি এসেওছেন। সন্ন্যাসিনী জানিয়েছেন:

> "তোমায় দেখিলাম। তোমার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নাই ত ভাই! তোমার মুখে সে 'না' শব্দ নাই ত ভাই! বেশ, বেশ! আমার সাধনা আজ সিদ্ধ হইল। তুমি তোমার পথে যাও ভাই! আমি চলিলাম।"[১৫]

এরপর দ্রুতগমনে তিনি চলে যান। গল্পকথক বারবার ডাকলেও তিনি ফেরেননি। তার ঠিক পরপরই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়। পাহাড়ের জলস্রোত নেমে এসে সেই ক্ষুদ্র নদীটিকে ভয়ানক করে তোলে। কে যেন অতিদূর থেকে কথকের আহ্বানের প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন 'না' বলে।

গল্পটির মধ্যে রয়েছে অসম্ভবের স্পর্শ। একে প্রেম বলা যায় কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে একটি 'না' যে নারীচিত্তকে আহত এবং ব্যাকুল করে তুলতে পারে, এই গল্প তারই উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই গল্প নারীর যৌবনমদমত্ত রূপের রূপান্তর। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি থেকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জগতে নারীর উত্তরণের কাহিনি

হয়ে উঠেছে এটি। হিমালয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত জলধর সেনের 'না' গল্পটি 'মানসী' পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মুক্তামালা' গল্পগ্রন্থের ষষ্ঠ রজনী— 'ডাকিনীর বাড়ী'তে ডাকিনীর অবস্থান হিমালয় পর্বতে। গল্পকথক যখন বৃক্ষ থেকে নামবার উপক্রম করছেন, তখন একটি ভয়াবহ দৃশ্য তাঁর নয়নগোচর হল। তিনি বৃক্ষতলে একটি অদ্ভুত জীব দেখলেন। প্রায় ছয় হাত লম্বা মানুষের মতো আকৃতির জীব। শুষ্ক চামড়া দিয়ে হাড়গুলি আবৃত শরীরের প্রাণী। মুখ ঝুনা নারকেলের মতো, দুই কানে সাদা রঙের দুটি কৃমি দোদুল্যমান! কৃমির আগায় কোলা ব্যাঙ! দুটি রক্তবর্ণের ঘূর্ণায়মান চক্ষু। সাদা রঙের দাঁত! গল্প কথক বুঝলেন, এই গাছটি আসলে ডাকিনীর গাছ। সেই অদ্ভুত জীবটি আসলে ডাকিনী ছাড়া কিছু নয়। মানুষের মতো আকৃতি হলেও ভয়াবহ জীব! হঠাৎ সেই ডাকিনী বৃক্ষ চলমান হল:

> "গাছ, দেশ প্রদেশ নদনদী অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় এক পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিকে গিরিশ্রেণী। সেই সমুদয় গিরিশ্রেণী নিবিড় অরণ্যে আবৃত। ইহাই কি হিমালয় প্রদেশ? এই স্থানে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ পৃথিবীতে অবতরণ করিল। পৃথিবী স্পর্শ করিবামাত্র ইহার মূল এরূপ ভাবে ভূমিতে লাগিয়া গেল, যেন বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষটি সেই স্থানেই চিরকাল বর্দ্ধিত হইয়াছে।"[১৬]

গল্পকথক বিবৃত প্রদেশটি হিমালয় কিনা সেই প্রশ্ন তুললেও, নিবিড় গিরিশ্রেণির যে রূপ তিনি তুলে ধরেছেন, তাতে হিমালয়ের রূপই চিত্রিত হয়েছে। আবার 'পাপের পরিণাম' গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়ে গল্পকথক তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে যে হিমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তেমন বিবরণ তুলে ধরেছেন। এই গল্পেও ভয়ানক সব ঘটনার কথা রয়েছে। নাক কাটা, বুক রক্তে ভেসে যাওয়ার বীভৎস রূপ সহ্য করতে না পেরে গুরুদেব যখন পলায়নতৎপর হলেন, তখন কথক শিষ্যটিও তাঁকে অনুসরণ করেন:

> "আমি তাঁহার সঙ্গে গমন করিলাম। প্রথমে আমরা কাশী যাইলাম। ক্রমে হিমালয় পর্বতে গিয়া উঠিলাম। সে স্থানে বড় শীত। দূরে আবৃত শ্বেতবর্ণের পর্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। তাহার পর পাহাড় হইতে নামিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বৃহৎ একটি নগরে গিয়া পৌঁছিলাম।"[১৭]

বনফুলের 'নতুন সিংহ' একটি অণুগল্প। এই গল্প যথেষ্ট ব্যঞ্জনাবহ। সাত বছরের ছোট্ট খোকন ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করেছে এ বছর পুজো কবে পড়েছে সে ব্যাপারে। সেলাইতে ব্যস্ত ঠাকুমা হঠাৎ তাকে উত্তর দেন যে, এ বছর পুজো হবে না! এ বছর মা দুর্গা আসবেন না! খোকন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। পুজোর সময় তার কত নতুন জামা কাপড় হয়। কত আনন্দ উৎসব চলে। সব কি তাহলে মাটি হবে!
মা দুর্গার না আসার কারণটি ব্যক্ত করেন ঠাকুমা। তিনি জানান:

> "মাংসর যা দাম আজকাল, সিংহ খাবে কি? মা দুর্গার অত পয়সা নেই।"[১৮]

কিন্তু মা দুর্গা এরোপ্লেনে করে তো আসতে পারেন, এমন প্রস্তাব দেয় খোকন। কিন্তু ঠাকুমা জানান যে, তিনি সিংহ ছাড়া অন্য কিছুতেই করে আসবেন না। তাছাড়া সেই সিংহ তো যা তা সিংহ নয়। তার যে অনেক মাংস লাগে। খোকন হতভম্ব হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে পাশের ঘরে চলে যায়। ঠাকুমা মুচকি হাসেন।

আধঘন্টা পরে খোকন ফিরে আসে এক অভিনব বুদ্ধি নিয়ে। সে নিজেই দুর্গাকে পিঠে করে বয়ে আনবে। তাই সে সিংহ সেজে এসেছে:

> "খোকন কালি দিয়ে প্রকাণ্ড গোঁফ করেছে, ঝাঁকড়া উলের টুপিটা মাথায় পরে কেশর করেছে, হামাগুড়ি দিয়ে ঘাড়টা উঁচু ক'রে রেখেছে বীর-বিক্রমে।"[১৯]

এমনকি ঠাকুমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই 'গাঁক-- গাঁক—গাঁক!' ঠাকুমা অবাক হয়ে জানান যে, খোকন যদি দেবী শক্তিকে পিঠে করে আনতে পারে, তবে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। খোকন এটাও জানায়, সিংহের মতো তার খাওয়ার খরচের জন্য মাত্রাতিরিক্ত খরচের ব্যাপার নেই। কোন খরচই হবে না। খোকন তো ঘরেই খাবে। খোকন এটাও জানে যে, মা দুর্গা কৈলাসে থাকেন। কিন্তু তার প্রশ্ন, এই কৈলাস ঠিক কোথায়? ঠাকুমা জানান যে, কৈলাস হিমালয় পাহাড়ে। কিন্তু অনেক উঁচু পাহাড়ে খোকন কিভাবে যাবে, এই চিন্তাতেই খোকন চিন্তিত হয়ে ওঠে। ঠাকুমার কথায় সে ঘুমিয়ে পড়লেও, তার স্বপ্নের জগতে হিমালয়—কৈলাস—সিংহ—মা দুর্গা ফিরে আসে:

> "ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে, অরণ্যের পর অরণ্য পার হয়ে সে চলেছে মা দুর্গাকে আনতে। সত্যিই যেন সিংহ হ'য়ে গেছে সে। ঘাড়ে গজিয়েছে কেশর, চোখে জ্বলছে আগুন, গায়ে হয়েছে অসীম শক্তি। অরণ্য পর্বত লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে সে। সামনে কোনও বাধা এলেই সিংহগর্জনে ডাক ছাড়ছে—গাঁক্, গাঁক্, গাঁক্।"[২০]

কান্তি পি দত্তের 'ভজুদার হিমালয় যাত্রা' গল্পে ভজুদা যতখানি স্বমহিমায় হাজির, হিমালয় অবশ্য ততখানি মহিমায় বিরাজিত নন। না থাকাই সংগত। ভজুদা তো তখনও হিমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হননি। তিনি সবে মাত্র যাত্রা করেছেন হিমালয়ের উদ্দেশে। সে যাত্রায় তাঁর রয়েছে এক মর্কট বৈরাগ্য! মুখে যদিও বলে চলেছেন, ভোগের প্রতি চরম বিরক্তির কারণেই তাঁর সংসারের মায়া কাটিয়ে হিমবানের উদ্দেশে ট্রেনযাত্রা, তথাপি তাঁর আচার-আচরণে সে-কথা প্রতিফলিত তো হয়ইনি, বরং এক ভোগসুখপ্রত্যাশী সুযোগসন্ধানী বুদ্ধিমান যুবকের ছবি ফুটে উঠেছে। এমন যুবকের চিত্রকল্পের সঙ্গে তুলনা করা চলে পরশুরামের লেখা 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের। বিরিঞ্চিবাবার ফাঁকি জনসমক্ষে ধরা পড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি পালাতে পারেননি। কিন্তু কান্তি পি দত্তের ভজুদা সাধন-ভজনের নাম করে পালাতে পেরেছিলেন। পরিচিত পরিমণ্ডলে ভজুদা জানিয়ে দিয়েছিলেন: "ভাবছি হিমালয়ে গিয়ে সাধন ভজন শুরু করব। ...সংসার থেকে যখন মন চলে গেছে, আর সংসারের বন্ধনে বাঁধা পড়তে চাইনে; ...প্রথমে কুলু মানালি যাব, তারপর কিন্নরদেশ হয়ে হিমালয়ে।"[২১]

কৌপীন পরে কাঁধে একখানা কম্বল চাপিয়ে ত্যাগের পতাকা উড়িয়ে পরিচিত চেলাদের পরিত্যাগ করে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরেন ভজুদা। বিনা টিকিটে প্রথম শ্রেণিতে যাত্রা করেন। চেকারের হাত থেকে রক্ষা করেন কামরায় থাকা এক যাত্রী। বৃদ্ধ সহযাত্রীকে সদম্ভে তিনি জানান যে, দুম করেই সংসারের প্রতি তাঁর আসক্তি চলে গেছে। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ভজুদা লুচি আর মুরগির মাংস আয়েস করে খেয়েই এসেছিলেন। তথাপি সহযাত্রীদের কাছ থেকে চোখ বন্ধ করে সম্ভবত মুখলজ্জাকে আড়াল করে লুচি, পাঁঠার মাংসের কোর্মা, আলুর দম আর সন্দেশ খেতে কুণ্ঠিত হন না। শেষে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছ থেকে কয়েকটা সিগারেট খেতেও দ্বিধা করেন না তিনি। মিথ্যা সাধুত্ব ধরা পড়ার আগেই তিনি হঠাৎ বারানসীতে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন।

বিশ্বনাথকে দর্শনের জন্য নয়, এক মাড়োয়ারী বন্ধুর কাছে আশ্রয় পাবেন ভেবেই নেমে পড়লেন অকূল আতান্তরে। সে বন্ধুটি বাড়িতে নেই। বিশ্বনাথের কাছে ভজুদা ধরনা দিয়ে পড়লেন। কয়েকশ বেলপাতা চাপিয়েও 'অচল বিশ্বনাথের সচল হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না'। তাই তিনি নতুন একটি পথ খুঁজে নিলেন। রাস্তা থেকে একটি ভদ্র ষাঁড় খুঁজে বের করে তাকে কাহিয়ে দাইয়ে তয়াজ করে তার আস্থা অর্জন করলেন। ষাঁড়টি ভজুদার বাধ্য হয়ে উঠলে তিনি তার পিঠে চড়ে দিব্যি বেড়াতে লাগলেন। এলাকায় 'ষাঁড়বাবা' নামে খ্যাতিলাভও

করলেন অনতিবলম্বে। নেশাখোর শিষ্যের দল জুটে গেল তাঁর। একসময় এই মিথ্যা পসারে তাঁর বিরক্তি এসে গেল:

> "অতএব একদিন গেরুয়া বসন পরে ষাঁড়ে চেপেই রেল স্টেশনে এলেন, এখান থেকেই তিনি টেনে চেপে যাত্রা করবেন, লক্ষ্ণৌ, কাঠগোদাম, আর গাড়োয়াল হয়ে হিমালয়ের পথ ধরে এগিয়ে যাবেন, মনে মনে এই সংকল্প নিয়ে বেনারস রেলস্টেশনে এসেছেন। যখন একবার সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে এসেছেন, তখন আর উল্টোডাঙায় ফিরে যাওয়া নয়, হিমালয়ে গিয়ে সত্যিকারের সন্ন্যাসী হওয়াই উত্তম।"[২২]

বারানসীর চেলারা তাঁকে ছেড়ে দিতে নারাজ। তাদের কেউ জয়ধ্বনি দেয় তো কেউ কেঁদে প্লাটফর্মে গড়াগড়ি দিতে থাকে! তবুও ভজুদার মন গলল না। তিনি বিনা টিকিটে যথারীতি ট্রেনের প্রথম শ্রেণির আসন দখল করেন। এবারে চেকার অবশ্য ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাঁকে ছাড়তে চাননি। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ট্রেন থেকে তাঁকে নামিয়ে দেবার কথা বললে ভজুদা বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে আধ ঘন্টা পর ট্রেনসুদ্ধ পুড়িয়ে খাক করে দিতে চান! সেখানে থাকা দুজন যাত্রী অবশ্য এমন বচনে ঘাবড়ে গিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা হতে অনুরোধ করেন এবং তাঁর টিকিটের ব্যবস্থা করেন।

অভিনব এই গল্পে হাস্যরসের ওপার সম্ভার উপহার দিয়েছেন সাংবাদিক সাহিত্যিক কান্তি পি দত্ত। বাংলা সাহিত্যের বিরাট পরিধিতে বিস্মৃত এই গল্পটিতে পরোক্ষে হিমালয়, হিমালয়ের সাধুদের জীবন এবং যাত্রাপথের আভাস এসেছে বারবার। এমনকি গল্পের শেষে লেখক জানিয়েছেন যে, কৌপীনধারী ভজুদা কাঠগোদামে পৌঁছানোর পর পায়ে হেঁটে হিমালয়ের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন। হয়তো ভণ্ড সাধুত্বের খোলস ছেড়ে ভজুদা এবার ভজনানন্দে মেতে উঠতে সক্ষম হবেন।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'হর-পার্বতী সংবাদ' গল্পটি আধুনিক যুগের প্রেক্ষিতে রচিত শিব-পার্বতী-হিমালয়ের কাহিনি। পৌরাণিক চরিত্রকে এ যুগের মাটিতে নবনির্মাণ করেছেন লেখক। রম্য রচনার ওস্তাদ শিল্পী সঞ্জীব শিব, পার্বতী আর হিমালয়কে সম্পূর্ণভাবে বাঙালি চরিত্রের আবহে প্রস্তুত করেছেন। গল্পের আখ্যান চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত— 'বুঝলে পার্বতী', 'এই যে ঠাকুর সাতশোবার ডায়াল করলুম', 'গণতন্ত্র জিনিস্টা কী বস্' এবং 'হিমালয়েই তো তোমার সামার হাউস'।

'বুঝলে পার্বতী' অধ্যায়ে শিব প্রথমেই 'বুঝলে পার্বতী' বলে সম্বোধন করার পরেই পার্বতী জানান যে, রেফযুক্ত নাম ধরে তাঁকে আহ্বান করার কী প্রয়োজন! তাঁকে 'পারু' বলে তিনি ডাকলেই তাঁর বড়ো মিষ্টি লাগে। বিশেষ করে এই সেদিন দেবাদিদেবের দাঁত বাঁধানো হয়েছে! রেফ, র-ফলা, যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতে গেলেই সেই দাঁত খুলে খুলে যাচ্ছে!

শরতের বোধন আসার আগে ভক্তরা যে পৃথিবী থেকে 'আ যা, আ যা, মেরে জান, দিল পহছান' বলে আহ্বান করছে, তা মহাদেব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন! এমনকি যেখানে তাঁর পারু আসতে যাচ্ছেন, সেখানকার জনগণ ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তির জন্য ক্ষেপে আছে! মহালয়ার ভোরে দেবীবন্দনার কথা শুনে শিব অমিতাভ বচ্চনের গাওয়া 'জয় জয় শিবশঙ্কর' গানটির উল্লেখ করতে ছাড়েননি। সার্বজনীন পুজো অনেকটা আব বা টিউমারের মতো বেড়েই চলেছে মহাদেবের দৃষ্টিতে:

> "বাঙালির জীবনে আর কী আছে বলো? চাকরি নেই, বাকরি নেই, জল নেই, আলো নেই, খাদ্য নেই, বাসস্থান নেই, সুখ নেই, নিরাপত্তা নেই, শিল্প নেই, সংস্কৃতি নেই। থাকার মধ্যে এই পুজোটুকু আছে।"[২৩]

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু যে রঙ্গে ভরা, তা শিবের অনুভবে যথার্থই ধরা পড়েছে। দাবি, মিছিল, ফুটবল, যাত্রা, বোম, ছোরাছুরি, ভোট, বন্যা, বনমহোৎসব আর বননিধন নিয়ে চলা পশ্চিমবঙ্গে পার্বতীকে আসতে নিষেধ করছেন দেবাদিদেব। সরস্বতী আবার নাকি রাজনীতিতে নাক গলিয়েছেন! বিশ্বকর্মা এত কিছুর মধ্যেও বেশ আছেন। কল নেই, কারখানা নেই, তবু শিল্পের সমাধিতে হাতি চেপে বেশ ঘুরে যেতে পারেন! পুজোর নামে ব্যবসা শিবের একেবারেই না-পসন্দ। ফ্যাশান তাঁর কাছে ভয়ানক ব্যাপার:

> "ফ্যাশানের মুখে ঝাড়ু মারো! আর বটমলেস, টপলেস কী জানো? বাক্স আছে, মাল নেই। খুলে পরো। কী পরো? মায়া কাঁচুলি। সব খোলা। উদোম। সি সি সিটি। সাধে আমি একটি পাথরের লিঙ্গ হয়ে মন্দিরে-মন্দিরে বসে আছি!"[২৪]

'এই যে ঠাকুর সাতশোবার ডায়াল করলুম' অধ্যায়ে বারোয়ারি পুজো কমিটির কর্তারা পার্বতীর কর্তা শিবকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রিপোর্ট পোঁছে দিচ্ছেন। মা দুগ্‌গা এখানে এসে ভালোই আছেন। বরং পুজোর ভিড়ের সময় স্বয়ং শিব এলে শহরে ঢুকতে পারবেন না। রাস্তা দিয়ে তাঁর ষাঁড় যাওয়ার ছাড়পত্রই পাবে না। শিবকে 'মেয়েলি দেবতা' বলে সরাসরি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি পুজোর উদ্যোক্তারা।

এমনকি এমন কথোপকথন কালে পার্বতী মর্ত্যলোক থেকে উদ্যোক্তার মোবাইলে ফোন পর্যন্ত করেন। উতলা বাবা শিবের সঙ্গে কথাও বলেন। পার্বতী জানিয়েছেন, টেম্পোতে করে যাওয়ার সময় নাকের মেক-আপ নষ্ট হয়ে গেছে; আর দশভুজার একটা হাত গেছে খুলে! মর্ত্যে পৌঁছে কোন সুখ নেই দেবীর:

> "খোঁটায় বেঁধে রেখেছে তাই, নৈলে সপরিবারে কৈলাসের দিকে দৌড় লাগাতুম। সরস্বতীটা বেঁচেছে। ডাস্ট অ্যালার্জিতে সর্দি হয়েছে। লক্ষ্মী কাল থেকে ফোঁস ফোঁস করছে আর বলছে বোম্বে পালাব।"[২৫]

শিব ফোনেই পার্বতীকে পরামর্শ দেন যে, কোন ব্যাপারে তিনি যেন নাক না গলান। আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কারো প্রার্থনা তিনি যেন না শোনেন। ওটা অসুরের ব্যাপার বলে তিনি যেন এড়িয়ে যান। নাটকীয় হাস্যরসাত্মক কথোপকথনের দিকটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে সমগ্র গল্পেই। একটি দৃষ্টান্ত:

> "বারোয়ারির হিসেবে লেখা থাকে পাঁচ পয়সার সিদ্ধি। আসার সময় পুরিয়াটা নিয়ে এসো। গণশা কী করছে?
>
> আহা, বাছা আমার ঘুমিয়ে পড়েছে গো। নাক ডাকছে।
>
> শোনো দুম করে না জেনে অসুর টসুর মেরে বোসো না। কে কোন দলের জানা না থাকলে ক্ষুর চালিয়ে দেবে।
>
> পাগল হয়েছ কত্তা। আমি কি সেই মেয়ে? এওকাল অসুর মারব-মারব করছি। সত্যিই কি মেরেছি। অসুর না থাকলে আমার পুজোই বন্ধ হয়ে যাবে।"[২৬]

'গণতন্ত্র জিনিসটা কী বস্' অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান এবং মহেশ্বরের মধ্যে কথোপকথন রম্যরস বেশ জমিয়ে তুলেছে। পরমেশ্বর মহেশ্বরের কাছে জানতে চেয়েছেন যে, তিনি জগৎ এবং প্রজা সৃষ্টি করে পৃথিবীটাকে লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দেওয়ার পর জগৎ কেমন চলছে? মহেশ্বর জানিয়েছেন, সবই তালগোল পাকিয়ে গেছে। মানুষের মতো বেয়াড়া জীব এই ব্রহ্মাণ্ডে আর নেই। এরা ক্ষমতা আর টাকা ছাড়া কিছুই চেনে না। মহেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে পরমেশ্বর ভারতভূমি দর্শন করতে আগ্রহী হলেন। কেন ভারতে?

> "ভারত হল পুণ্যভূমি। গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনা যে দেশে প্রবাহিত। যার উত্তরে দেবতাদের আবাসস্থল, হিমালয়। যুগ-যুগ ধরে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা সেই গিরি করে বসে দিবা নিশি আমার নাম করে চলেছে।"[২৭]

কিন্তু হিমালয় দর্শন করে পরমেশ্বর চূড়ান্ত বিরক্ত হয়েছেন। যেখানে সেখানে মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ঝাণ্ডা পোঁতা রয়েছে। তার সঙ্গে হিমালয়ে প্রচুর বর্জ্য পদার্থ ফেলে গিরিরাজের সৌন্দর্য এবং মাহাত্ম্য নষ্ট করার প্রচেষ্টা দেখে পরমেশ্বরের মন্তব্য:

> "মহেশ্বর, ভারতীয়রা দেবতাত্মা হিমালয়ের এইভাবে, এঁটো-কাঁটা ফেলে মাহাত্ম্য নষ্ট করছে? বেদ-বেদান্তের দেশের মানুষ কি শেষে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে গেল!"[২৮]

মহেশ্বর তাঁকে আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনীতির কাহিনি শোনালেন। জানালেন গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল ইন্দিরা শাসিত ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরমেশ্বর ইন্দিরার সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ায় মহেশ্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করলেন। কিন্তু মহেশ্বরকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের লোকেরা চিনতে পারলেন না। অবশ্য সব কথা শুনে স্বয়ং ইন্দিরা মহেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উঠেপড়ে লাগলেন। স্যাটেলাইট ব্যবহার করেও চেষ্টা চালানো হল। কিন্তু কোন লাভ হল না।

চতুর্থ অধ্যায় 'হিমালয়েই তো তোমার সামার হাউস'। এই অধ্যায়েও পরমেশ্বর এবং মহেশ্বরের কথোপকথন হয়েছে। মহেশ্বর জানিয়েছেন যে, মানব, দানব, দেবতা কারু চরিত্র ঠিক সুবিধের নয়। তাই তিনি হিমবাহ, পাহাড়, গুহা, গহ্বর দিয়ে 'পারু'কে আড়াল করে নিরাপদে রেখেছেন। হিমালয়ে শীত শীত করায় ঝাল চানাচুর দিয়ে চা খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন মহেশ্বর। আর পৃথিবীর হাল যথেষ্ট খারাপ হওয়ায় মহেশ্বর পরমেশ্বরকে বলেছেন, তিনি যেন পৃথিবীটাকে শয়তানের হাতে দান করে দেন। শয়তান ছাড়া মানুষকে কেউ শায়েস্তা করতে পারবে না। নিম্নমানের ভক্তদের সঙ্গে মিশে মহেশ্বরের মুখের ভাষা যথেষ্ট নিম্নমানের হয়ে গেছে। পরমেশ্বর সেই বখে যাওয়া ভাষায় চূড়ান্ত বিরক্তি বোধ করেছেন। এই পরমেশ্বর শেষ পর্যন্ত নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে বলেছেন:

> "যদি বলি আমিই শয়তান। তোমরা এতকাল যাকে পরমেশ্বর ভেবে এসেছ, আসলে সে ছদ্মবেশী শয়তান। জীবিতের রাজত্বের মালিক হল শয়তান। মৃত্যুর রাজা ঈশ্বর। ...কী সত্য আর কী মিথ্যা, এ বিচারের ভার আমি তোমাদেরই দিয়ে গেলুম। আমার কাছে সত্যও নেই, মিথ্যাও নেই।"[২৯]

নন্দী আর মহেশ্বর পৃথিবীর আকাশে কিসের একটা হাহাকার শুনে ভূপালে নামতে গিয়ে একেবারে ডিগবাজি খেয়ে দুম করে মাটিতে পড়লেন। সেটা ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার সময়। ফলে মহেশ্বরকেও অসীম শ্বাসকষ্টে জ্ঞান হারাতে হল! তাঁর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন পরমেশ্বর। সমুদ্রমন্থনকালে হলাহল ধারণ করার ক্ষমতা থাকলেও ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা মহেশ্বরকে কাতর করে তুলল। মানুষের বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যেন শয়তানের পথকেই সুগম করেছে। আর পরমেশ্বর সব কিছু দেখে শুনে নিজেকে সৃষ্টির ভেতর পাউডারের মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন!

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের এই গল্পে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন লেখক। হিমালয়কে নিয়ে মজা করার অবকাশটুকুও মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পার্বতী ছাড়েননি। পৌরাণিক কাহিনিকে এ যুগের মাটিতে আছড়ে ফেলে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি তাঁর অভিনব পদ্ধতি ও প্রকরণের নিজস্ব দিক।

বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির হিমালয়-ভাবনার আমূল বিবর্তন যে ঘটেছে, বাংলা কাব্য-প্রবন্ধ-ভ্রমণ সাহিত্যের পাশাপাশি কথাসাহিত্যের ধারাতেও তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের সুবিশাল পরিসরে শৈলরাজ হিমালয় বহুরূপে বহু সহস্রবার উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোগল্পের ধারায় নিঃসন্দেহে সেই বিস্তার ও বৈচিত্র্য প্রবলাকার ধারণ করেনি। হিমালয়প্রেমিক বাঙালি পাঠকের এই বেদনার উপশম ঘটাতে পারেন যুগান্তরের গল্পস্রষ্টা— দেবতাত্মা হিমালয়ের বরপুত্রেরা।

তথ্যসূত্র:

১) দেবী, স্বর্ণকুমারী। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন। সেন, অভিজিৎ ও ভাদুড়ী, অনিন্দিতা সংকলিত, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০, পৃ. ১০৮।

২) তদেব, পৃ. ১০৯।

৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, তিনখণ্ডে প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৩, পৃ. ২৯৫

৪) তদেব, পৃ. ২৯৯।

৫) তদেব, পৃ. ৩০।

৬) তদেব, পৃ. ৩০৩।

৭) তদেব, পৃ. ৭৩৮।

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৮, পৃ. ২২৫।

৯) তদেব, পৃ. ২২৩।

১০) রায়, হেমেন্দ্রকুমার। হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী। প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা গীতা দত্ত, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৯২।

১১) তদেব, পৃ. ১৯৬।

১২) সেন, জলধর। জলধর সেনের নির্বাচিত গল্প। মিশ্র, সুবিমল সম্পাদিত, বাণী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ১৮।

১৩) তদেব, পৃ. ১২১-১২২।

১৪) তদেব, পৃ. ১২৪।

১৫) তদেব, পৃ. ১২৪।

১৬) মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী। অখণ্ড সংস্করণ, পাত্র, প্রফুল্লকুমার সম্পাদিত, পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭, পৃ. ৬৯৬।

১৭) তদেব, পৃ. ২২৮।

১৮) মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। বনফুলের গল্প সমগ্র। চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০, পৃ. ১২।

১৯) তদেব, পৃ. ১২।

২০) তদেব, পৃ. ১৩।

২১) দত্ত, কান্তি পি। ভজুদার হিমালয় যাত্রা। কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃ. ৪২-৪৩।

২২) তদেব, পৃ. ৫৩।

২৩) চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব। ৫০টি প্রেমের গল্প। পারুল প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ৩৮২।

২৪) তদেব, পৃ. ৩৮৩।

২৫) তদেব, পৃ. ৩৮৯।

২৬) তদেব, পৃ. ৩৯২।

২৭) তদেব, পৃ. ৩৯৫।

২৮) তদেব, পৃ. ৩৯৯।

২৯) তদেব, পৃ. ৪০৪।